ষষ্ঠ অধ্যায়

শব্দার্থ তত্ত্ব

ষষ্ঠ অধ্যায়

শব্দার্থতত্ত্ব (Semantics)

ভাষার ক্ষুদ্রতম একক বাগধ্বনি কিন্তু কার্যকর একক হল রূপমূল বা মূলরূপ বা রূপিম। ধ্বনি এবং মূলরূপের মধ্যে মৌলিক তফাত হল এই যে, ভাষায় ধ্বনির কার্যকর ব্যবহার ঘটে না, যতক্ষণ না এক বা একাধিক ধ্বনি সহযোগে গঠিত ভাষিক এককে কোনো অর্থ প্রকাশ পায়। অর্থ — মূলরূপের, শব্দাংশের এবং বাক্যের প্রাণ। তাই মূলরূপের যেমন অর্থ থাকে তেমনি একাধিক বা একটি মূলরূপের দ্বারা গঠিত শব্দেরও অর্থ থাকে। আবার একাধিক শব্দ নিয়ে গঠিত বাক্যাংশেরও যেমন একটি অর্থ থাকে তেমনি একাধিক শব্দ দ্বারা, বাক্যাংশ দ্বারা গঠিত পূর্ণাঙ্গ বাক্যেরও সামগ্রিক ও বৃহত্তর অর্থ থাকে। শব্দ এবং অর্থ যেন পার্বতী-পরমেশ্বর। তাই বলা যেতে পারে, "যে বিদ্যা, জ্ঞান বা শাস্ত্র শব্দের অর্থ (তথা অর্থ পরিবর্তন, পরিবর্তনের কারণ) এবং ভাষায় অর্থ-পরিবর্তনের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করে তা-ই শব্দার্থতত্ত্ব বা Semantics।"[১]

সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে শব্দের অর্থেরও পরিবর্তন ঘটে। অর্থ কখনও পূর্বোক্ত অর্থ থেকে সরে এসে ভিন্নতর দিশা গ্রহণ করে, কখনও সেই অর্থের সংকোচন ঘটে তো কখনও প্রসারণ। ভাষাতেও শব্দার্থের এই রূপান্তর লক্ষণীয়। শুধুমাত্র ব্যুৎপত্তিগত দিক থেকেই নয়, মান্য চলিত বাংলার পরিপ্রেক্ষিতেও এখানে ব্যবহৃত বহু শব্দ পুরোপুরি আলাদা অর্থ প্রকাশ করছে। বিবর্তনের ধারায় শব্দার্থ পরিবর্তনের কারণগুলির মধ্যে আলঙ্কারিক প্রয়োগ, সৌজন্য ও সুভাষণ রীতি, বাক্যাংশের অর্থসংহতি, সমনাম ইত্যাদি বিদ্যমান। অন্যদিকে শব্দের অর্থবিস্তার, অর্থসংকোচও অর্থসংশ্লেষ বা অর্থ সংক্রম — শব্দার্থ বিবর্তনের এই তিন রূপই আমাদের সমীক্ষা ক্ষেত্রের অন্তর্গত ভাষায় বিদ্যমান। নিচে শব্দের অর্থ পরিবর্তনের কারণ ও পরিবর্তনের ধারাগুলি সূত্রাকারে আলোচনা করা হল —

১. শব্দার্থ পরিবর্তনের কারণ

১.১ আলঙ্কারিক প্রয়োগ

শব্দের শক্তি অসীম। একই কথার অসংখ্য ব্যঞ্জনা থাকে। বক্তা যখন ভাববিশেষের প্রতি শ্রোতার মন আকর্ষণ করে তখন বিশেষণ, উপমা প্রভৃতির ব্যবহার করে থাকে। একেই বলা হয় আলঙ্কারিক প্রয়োগ। আলঙ্কারিক অর্থে কোনো শব্দ, প্রবাদ-প্রবচন বা ধাঁধায় ব্যবহৃত হতে থাকলে অনেক সময় সেটি আলঙ্কারিক তাৎপর্য হারিয়ে অর্থের পরিবর্তন ঘটায় বা গতানুগতিক অর্থেই প্রচলিত হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে শব্দ বা বাক্যের দুটি অর্থ থাকে — একটি বাইরের অর্থ বা বাচ্যার্থ আর অন্যটি লক্ষণার মধ্য দিয়ে ব্যঙ্গার্থ বা ভাবার্থ। যেমন —

ক. কাখে আমি বলবো ভালো ডা[ই]ল্ চাপিঙে হাগতে য্যালো।

—বাচ্যার্থে বক্তার কাছে কোনো মানুষই ভালো নয় কিন্তু ভাবার্থে শাশুড়িটি তার বধূটির

নিন্দা করছে।

খ.কুঁড়্যা লাপিতের ভাঁড় মোটা। — বাচ্যার্থে এমনিতেই নাপিতটি কুঁড়ে বা অলস প্রকৃতির, উপরন্তু তার মাথায় ক্ষুর কাঁচি ইত্যাদি রাখার আধার বা ভাণ্ডটি বর্তমান। কিন্তু এর মধ্য দিয়ে যে কোন ব্যক্তি খুবই নিষ্কর্মা হলে উপরি উক্ত দৃষ্টান্তটি দেওয়া হয়।

গ. ওটে আমার কেটে। — বাচ্যার্থে ওরে সে আমার কেউ নয় রে, কিন্তু ব্যঙ্গার্থে অপছন্দের লোক প্রসঙ্গে উপরি উক্ত উপমাটি প্রয়োগ করা হয়।

ঘ. দাইয়ের কাছে প্যাট নুকনো। — বাক্যটির বাইরের অর্থ হল ধাইয়ের কাছে পেট কে গোপন করা। কিন্তু এর ভিতরের অর্থটি হল গর্ভাবস্থাকে গোপন করা।

ঙ. দরবারে মুক্ না পায়, ঘরে যেঙে মাই গ্‌কে কিল্যায়। — এখানে বাচ্যার্থ হলো সভা-সমিতিতে বা পঞ্চজনের কাছে কথা বলার সুযোগ না পেলেও বাড়িতে গিয়ে স্ত্রীকে কিল মারে। অন্যদিকে 'মুক্' এবং 'কিল' শব্দদুটির ভাবার্থ হলো যথাক্রমে মানসম্মান এবং শাসন গর্জন।

চ. আই ল্ গুঁড়াতে লড়াই, আর মেগের কাছে বড়াই। — এখানকার বাইরের অর্থটিও আগের উদাহরণটির মতোই। ভাবার্থ হলো জমিতে বা লড়াই করবার মঞ্চে সে যায়নি কিন্তু স্ত্রীর কাছে এসে অনেক রাজা-উজির মারার গল্প করেছে।

ছ. য্যামুন হ্যাঁট্‌কা ত্যামুন মসুরি। ভাবার্থে দুপক্ষই সমান। [হ্যাঁট্‌কা — ডালজাতীয় দানাশস্য কিন্তু ডাল নয় এবং অসিদ্ধ থাকে]

এছাড়াও 'মুখের মিষ্টি', 'হাড়-মাস ভাজা ভাজা', 'হাড়-কালি' প্রভৃতি শব্দও অলংকৃত শব্দের উদাহরণ।

১.২ সৌজন্য ও সুভাষণ রীতি ঃ

সৌজন্য হল বিনয় প্রকাশের একটি অঙ্গ; অন্যদিকে সুভাষণ হলো সংস্কারপূত হয়ে অশুভ বিষয় বা বিপজ্জনক বস্তুর শুভ বা শোভন নামকরণ। যেমন —

ক. অনেক অবস্থাপন্ন ব্যক্তিও বিনয়বশত নিমন্ত্রণের সময় বলেন 'গরীবের ঘরে একটু পায়ের ধুল[অ] দিঙে শাকভাত খেঙে যাবেন।' — নিমন্ত্রণ বাড়িতে হয়তো আমিষ-নিরামিষ উভয় পদের প্রাচুর্য্য থাকলেও বিনয়বশত 'শাক ভাত' খাওয়ার কথাই বলা হয়।

খ. দশ — শব্দটি বিশুদ্ধ সংখ্যা শব্দ (Cardinal Number) কিন্তু এখানে সমাজকে বোঝানো হয়। যেমন — 'দশের মাথা', 'দশের কাজ' ইত্যাদির প্রয়োগে বিনয়ের প্রকাশ ঘটে।

গ. ঘাট — গ্রামের মহিলারা প্রাতঃ কৃত্যাদি সারতে, বাহ্য ফিরতে পুকুর, নদীর ঘাটে যায়। তারা প্রাকৃতিক কর্মাদি সমাপন করতে যাওয়ার কথা মুখে না বলে সুভাষণের আশ্রয় নিয়ে 'ঘাটকে যাওয়া'র কথা বলে। যেমন — 'ঘাটকে যাবি ন্যাটে, ব্যালা যি বাউরিং গ্যালো।'

ঘ. ঘরে চাল না থাকা কে সুভাষণের আশ্রয় নিয়ে বলা হয় 'চাল বাড়ন্ত' বা 'ভাঁড়ে মা ভবানী।' এয়োতির শাখা ভেঙে গেলে বলা হয় 'শ্যাকা বেড়ে য', রান্নার বা কাজের পরিচারিকাকে 'কাজের মাসি' বলা হয়।

ঙ. জি — শব্দটি সংস্কৃত 'জীব' থেকে এসেছে। মূলত মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকেরা বয়স্ক বা বয়সে বড় এমন ব্যক্তিদেরকে 'জি' বলে সম্বোধন করে। 'জি' শব্দের এই ব্যবহার, অনেকটা ইংরাজিতে 'Sir' শব্দের প্রয়োগের কথা মনে পড়াই। যেমন — অকে আর কি বলব জি, "উতো কম্মে কুঁড়্যা ভোজনে ডেড়্যা।"

১.৩ বাক্যাংশের অর্থসংহতি ঃ

ভাষা ব্যবহারে শৈথিল্যের বশে অনেক সময় একটা শব্দগুচ্ছের পুরো অংশটি ব্যবহার না করে তার অংশ বিশেষ দিয়ে আমরা কাজ চালাই। তার ফলে অনেক ক্ষেত্রে সংহত হয়ে বাক্যাংশটি একটিমাত্র পদে পরিণত হয়। যেমন —

ক. 'ছাড়া' অর্থে ময়লা জামাকাপড়ের মালিন্যমুক্ত হওয়া — পরিষ্কার করার ফলে। কাপট্টো ছেড়েছে — অর্থে কাচার ফলে কাপড়টির ময়লা দূর হয়েছে।

খ. 'দণ্ডবৎ'। মূল বাক্যটি ছিল 'দণ্ডবৎ প্রণাম।'

গ. 'ফল ফুলরি খাব' — অর্থে ফল, মিষ্টি, নোনতা ইত্যাদি ভক্ষণ করব।

ঘ. 'খবরদার যেয়ো ক্যানি?'

'হোক'।

এখানে 'হোক' শব্দটির মধ্যে দিয়ে 'তাইহোক' অর্থাৎ আচ্ছা যাবো অর্থ প্রকাশিত এবং আমাদের সমীক্ষা ক্ষেত্রের পূর্বাংশে 'খবরদার' শব্দের অর্থ অতি অবশ্যই।

ঙ. 'সন্ধ্যা দ্যা' অর্থাৎ সন্ধ্যা বেলায় তুলসী তলায় প্রদীপ জ্বালিয়ে দেওয়া।

চ. দুধের রোজকার জোগান দেওয়া এবং নেওয়া অর্থে 'রোজ' কথাটি প্রচলিত। 'রোজ দ্যা' মানে বাঁধা খরিদ্দারকে প্রতিদিন দুধ বিক্রি করা এবং 'রোজ ল্যা' মানে বিক্রেতার কাছ থেকে রোজ দুধ নেওয়া।

ছ. কান্ঠা — শব্দটি সংস্কৃত 'কণ্ঠ' শব্দজাত (কণ্ঠ + আ)। যার অর্থ গলদেশ। বাড়ির গলদেশ বা পিছনের অংশ, তাই সংক্ষেপে কান্ঠা।

জ. কাগজি — অর্থ পাতিলেবু। এখানকার আঞ্চলিক ভাষায় লেবু বা কাগজিলেবু কথার প্রচলন নেই। শুধু 'কাগজি' বলা হয়। সেই সঙ্গে বড় পাতিলেবু অর্থে 'কাগ্জা' ব্যবহৃত হয়।

ঝ. পোছ্যা — পশ্চিমদিক থেকে আগত বাতাস কিংবা মারোয়াড়ি বা বিহারি সম্প্রদায়ের মানুষ। মূল অংশটি সংক্ষিপ্ত হয়ে বর্তমানে দাঁড়িয়েছে 'পোছ্যা'।

ঞ. ব'ধ' — বহন করে নিয়ে গিয়ে জিনিসপত্রের ধৌতাদি করা। সংক্ষেপিত হয়ে হয়েছে ব' ধ'।

ট. ভাদুর্যা — ভাদ্রমাসে উৎপন্ন ধান বা কলাই বিশেষ। মূল অংশ সংক্ষেপিত হয়ে হয়েছে ভাদুর্যা ধান, ভাদুর্যা কলাই।

ঠ. পৃথগন্ন — শব্দটি সংক্ষেপিত হয়ে হয়েছে পেথক/পৃথক (ভিন্ন)।

ড. 'বহন করছে' সংক্ষেপিত হয়ে হয়েছে, ব'ছে।

ঢ. 'চিনতে পারলাম না' বাক্যটি সংক্ষেপিত হয়ে হয় 'চিন্ল্যাম না।'

১.৪ লৈঙ্গিক সংস্রব (Association of Gender) ঃ

শব্দের অর্থ পরিবর্তনে লৈঙ্গিক সংস্রবের ভূমিকা আছে। যেমন —

ক. 'ভাতার' — শব্দটি সংস্কৃত 'ভর্ত্তৃ' শব্দ থেকে জাত। পুরুষদের কাছে শব্দটি খুব বেশি আলাদা অর্থ ব্যবহার করে না। কিন্তু নারী সমাজে এটির মধ্যে একটি অশ্লীলতার পরিচয় বহন করে। সেটি হল — 'স্বেচ্ছায় পতি গ্রহণ করা।' স্ত্রী ভাষায় 'বাপভাতারি', 'ভাইভাতারি', হাজারভাতারি', 'সাতভাতারি', গালাগালি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

খ. 'নাঙ' — শব্দটি সং. 'নগ্ন' থেকে জাত। এটি নারীর ভাষায় সমাজবহির্ভূত সম্পর্ককারিণী কোন মহিলা সম্পর্কে বলা হয়। পুরুষেরা পারতপক্ষে শব্দটি ব্যবহার করে না।

গ. প্যাট্ — পুরুষদের কাছে শব্দটির অর্থ 'উদর'। কিন্তু মেয়েদের কাছে শব্দটির অর্থ অবৈধভাবে সঞ্চারিত 'গর্ভ'। যেমন — 'প্যাট হ' মানে অবৈধভাবে গর্ভসঞ্চার হওয়া। 'প্যাট নামা' হল অবৈধভাবে সঞ্চারিত গর্ভস্থ ভ্রূণ কে গোপনে নষ্ট করা।

১.৫ সংস্কারজনিত বাচনিক নিষিদ্ধতা (Taboo) ঃ

ট্যাবুর ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায় ধর্মীয় বা সামাজিক কারণে কিছু সংখ্যক শব্দের প্রয়োগ অপ্রচলিত। ট্যাবুর ক্ষেত্রে সামাজিক ভাবে নিষিদ্ধ আচরণ বা শব্দ প্রকাশে সমাজের মানুষেরা ভিন্নতর প্রকাশরীতির মাধ্যমের সাহায্য গ্রহণ করে থাকেন। তার ফলে কোন একটি শব্দ নতুন অর্থ তাৎপর্য লাভ করে। নিষিদ্ধ শব্দ বা বাচনিক নিষিদ্ধতাকে ছয় ভাগে ভাগ করে দেখানো যেতে পারে। সেগুলি হল — লোকবিশ্বাস বা সংস্কারমূলক নিষেধজাত শব্দ, সৌজন্য বা শিষ্টাচারমূলক নিষেধজাত শব্দ, নামকরণে নিষেধজাত শব্দ, গোপনীয়তা বা লজ্জামূলক নিষেধজাত শব্দ, ঘৃণামূলক নিষেধজাত শব্দ এবং গালি বাচক শব্দ।[২]

১.৫.১ লোকবিশ্বাস বা সংস্কারমূলক নিষেধজাত শব্দ ঃ

ক. সাপ — লতা

রাতের বেলায় সাপের নাম মুখে আনতে হয় না। তাতে অনিষ্ট ঘটার ভয় আছে। তাই রাত্রে সাপ না বলে 'লতা' বলা হয়।

একই রকম ভাবে রাতের বেলায় 'চিতা বাঘকে' বলা হয় 'ঝিঙ্যা ফুলি', 'ভূতপ্রেত' না বলে বলা হয় 'ওনাদের', 'ত্যানাদের'।

খ. বসন্ত — মায়ের দয়া

বসন্ত হলে গা হাত পা জ্বালা করে ও অন্যান্য অনেক উপসর্গ দেখা দেয়। মা দশ মাস দশদিন গর্ভে ধারণ করে সন্তানকে লালন পালন করে বড় করে তোলে। সেই মায়ের যে কষ্ট সেই কষ্টের কথায় হয়তো স্মরণ করাই বসন্ত রোগ হলে। তাই এটিকে 'বসন্ত' রোগ বলা হয় না, বলা হয় 'মায়ের দয়া' — এরকম লোকবিশ্বাস।

গ. হলুদ — অং/রং

রাত্রে রান্নার সময় ব্যঞ্জনে ঠিক ঠিক হলুদ রং হয়েছে কিনা এই প্রসঙ্গটি এলে 'হলুদ' না বলে শুধু 'রং' বা 'অং' ঠিক হয়েছে কথাটি বলা হয়। লোকবিশ্বাস এই, রাত্রিতে হলুদের যথাযথ রং একমাত্র ডাইনিরা শনাক্ত করতে পারে। তাই কোনো মহিলাও যদি 'হলুদ' শব্দটি রাত্রিতে ব্যবহার করে তবে তাকে 'ডায়ন্' (ডাইনি) হিসেবে চিহ্নিত করতে পারে সমাজ। তাই ওই সময়ে 'হলুদ' অর্থে 'রং' বা 'অং' শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

১.৫.২ সৌজন্য বা শিষ্টাচারমূলক নিষেধজাত শব্দ ঃ

বাঙালি হিন্দু সমাজে এবং বাঙালি মুসলমানদের মধ্যেও নিরক্ষর এমনকি অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন নারীরা শ্বশুর, ভাশুর, স্বামীর নাম উচ্চারণ করে না। কারণ তা শিষ্টাচার বিরোধী। এমনকি অনেক স্থানে মেয়েরা শ্বশুর, ভাশুর ইত্যাদি শব্দ পর্যন্ত ব্যবহার করে না। ঠাকুর, বটঠাকুর ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে বিকল্প শব্দ হিসেবে। যেমন কোনো মেয়ের স্বামীর নাম তপন দাস হলে সেই মেয়েটি স্বামীর প্রসঙ্গ এলে বলে 'অমুক দাস'। পরবর্তীকালে সে কোনো সন্তানের পিতা হলে সেই সন্তানের নামের পরে 'বাবা' যোগ করে তার স্বামীকে চিহ্নিত করেন। যেমন 'বুবুনের বাবা', 'স্বপনের বাবা', এমনকি শ্বশুর মশাইকেও 'বুবুনের দাদু', স্বপনের দাদু' হিসেবে চিহ্নিত করেন।

১.৫.৩ নামকরণে নিষেধজাত শব্দ ঃ

নিরক্ষর, গরিব ও সমাজে ব্যক্তিত্বহীন মানুষের একটি নষ্ট নামও লক্ষ করা যায়। অনেক সময় নষ্ট নামের আড়ালে তার প্রকৃত নামটি চাপা পড়ে যায়। ওই ব্যক্তির আচরণ, স্বভাব, দেহের গঠন, শরীরের বর্ণের প্রেক্ষিতে ও অন্ধসংস্কারবশত অপদেবতার কুদৃষ্টি থেকে রক্ষা পাবার জন্য এই নামকরণ করা হয়। যেমন —

গোবরা (পুং.) — গোবর + আ
গুরা (পুং.) — গুরুবারে জন্ম বলে এরূপ নামকরণ।
মড়া (পুং.), মড়ি (স্ত্রী) — জন্ম থেকেই যে খুব রোগা পাতলা।
কালু/কেল্যা (পুং.) — গায়ের রং কালো বলে এরূপ নামকরণ।
ডাবা কুজি (স্ত্রী) — বেঁটে এবং কুজযুক্ত বলে এরূপ নাম।
গুড্ডু (পুং.) — বেঁটে খাটো চেহারার বলে এরূপ নাম।
কিনা (পুং.) — যাকে কিনে নেওয়া হয়েছে।
পচা (পুং.) — পঞ্চানন থেকে বিকৃত হয়ে পচা।
ম্যাঘা (পুং.) — মেঘনাদ + আ, সংক্ষেপে ম্যাঘা।
মুন্‌সারাম (পুং.) — মা মনসা এবং রামের কু দৃষ্টি থেকে যাতে রক্ষা পায় তার জন্য এই নাম।
স-অ-গি (স্ত্রী) — খুব সোহাগের সেজন্য এই নাম।

ফুদ্‌ফুদি (স্ত্রী) — বেশি কথা বলে তাই এই নাম।
কটা (পুং.), ক'টি (স্ত্রী) — গাত্রবর্ণ এবং চুলের রং তামাটে বা কটা (Brown), তাই।

১.৫.৪ ঘৃণামূলক নিষেধজাত শব্দ ঃ

হয়তো কেবল ঘৃণাই — ঘৃণাজাত শব্দগুলির মূলে। যেমন বাংলা সাধুভাষায় ব্যবহৃত শব্দ মল-মূত্র সাধারণত ভদ্র সমাজে উচ্চারিত হয় না। অনেক সময় যেসব বিকল্প শব্দ তার পরিবর্তে ব্যবহৃত হয় সেগুলি সংস্কৃত শব্দ তো বটেই, তদুপরি সুভাষণ অলংকারের দৃষ্টান্তও। যথা — গুহ্য, বাহ্যি ফেরা (হাগতে যাওয়া), নরবর (পায়খানা, গোবরের সাদৃশ্যে) জলে ভাসমান বিষ্ঠাকে 'ন্যাড়া' না বলে, বলা হয় ছ্যানাবড়া (এক প্রকার মিষ্টান্নের সাদৃশ্যে) ইত্যাদি।

১.৫.৫ গোপনীয়তা বা লজ্জামূলক নিষেধজাত শব্দ ঃ

এগুলি প্রধানত নারীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে দেখা যায়। এগুলি প্রধানত স্ত্রী-অঙ্গ এবং স্ত্রী - শরীরবৃত্ত বিষয়ক; অর্থাৎ ঋতু, গর্ভসঞ্চার, গর্ভধারণ, স্রাব, গর্ভপাত, প্রসব, এবং দেহে যৌবন লক্ষণ সংক্রান্ত শব্দ।

ক. গায়ে হ — ঋতুমতী হওয়া। 'ঋতু' শব্দটিও সুভাষণ। 'ঋতু', 'মাসিক', এমনকি 'পিরিয়ড' শব্দগুলি নিতান্ত বাধ্য না হলে মহিলারা ব্যবহার করেন না। আমাদের সমীক্ষা ক্ষেত্রের অন্তর্গত ভাষায় মহিলাদের মধ্যে মাসিক হওয়া অর্থে 'গায়ে হোলছে' শব্দটির প্রচলন রয়েছে। এছাড়াও ঋতুস্রাব হওয়া অর্থে 'শরীর খারাপ' কথাটির চল আছে। 'শরীর খারাপ' শব্দটি অর্থসংকোচের নামান্তর।
খ. 'প্যাট নামানো', 'প্যাট হ' — শব্দগুলির মধ্যে দিয়ে অবৈধ ভাবে সঞ্চারিত গর্ভস্থ ভ্রূণের গোপনে গর্ভপাত ঘটানো এবং অবৈধ ভাবে মেলামেশার ফলে গর্ভসঞ্চারকে বোঝায়।
গ. প'তি (< পোয়াতি) শব্দটি সংস্কৃত 'পুত্রবতী' শব্দজাত। আসন্ন প্রসবা মহিলা এবং সদ্য প্রসূতিকে 'প'তি' বলা হয়।
ঘ. সোমোত্ত — শব্দটি 'সমর্থ' থেকে জাত। বিবাহের উপযুক্তা কে বলা হয় 'সোমোত্ত মেয়্যা'।
ঙ. আঁইজ[অ] — একটি সন্তানের জন্ম কাল থেকে পরবর্তী গর্ভাধানের ব্যবধানকে বলে আঁইজ[অ]। শব্দটি মেয়েরা নিজেদের মধ্যে ব্যবহার করে।

১.৫.৬ গালি বাচক শব্দ ঃ

গালির মধ্য দিয়ে একজন অন্যজনকে মানসিকভাবে আহত, পীড়িত এবং লজ্জিত করে। গালি বাচক শব্দের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকতে পারে হননেচ্ছা, ঘাতেচ্ছা, ধর্ষণেচ্ছা ইত্যাদি। গালির মধ্যে দিয়ে দুই ধরনের অবদমন (inhibition) থেকে মুক্তি খোঁজে মানুষ। প্রথমত নারী, নারীদেহ এবং যৌনসংযোগ সম্পর্কিত বিধিনিষেধ লঙঘন (violation), দ্বিতীয়ত আঘাত ও হত্যা সম্বন্ধে

বিধিনিষেধ লঙ্ঘন। কাউকে গালি দিয়ে কিংবা কোনো মেয়েকে উত্যক্ত করে অবচেতন মনের অবদমিত ইচ্ছা পূরণের তৃপ্তি সাধন হয়ে থাকে বলেও কোন কোন মনোবিজ্ঞানী মনে করেন।

কেউ যখন কাউকে 'শালো' বলে তখন সেটা গালি বলে গণ্য হয় এইজন্যে যে, ওই শব্দের মধ্যে দিয়ে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির ভগ্নীর সঙ্গে অবৈধ সংসর্গের ইঙ্গিত থাকে। এরকম আরো কয়েকটি গালির দৃষ্টান্ত —

নামাউঠ[অ] / নামাউঠ্যা	—	যার অর্থ ওলা ওঠা বা কলেরা হোক।
আল্লা	—	অল্প + আয়ু > অল্পায়ু > আল্লা অর্থাৎ অল্প আয়ু হোক্।
খালভরা	—	এই শব্দটির মধ্য দিয়ে তোমার এবং তোমার পরিজনের মৃতদেহে খাল ভরে যাক যা সংক্ষেপে খাল ভরা।
মা তারা লেক্	—	তারাপীঠে মহাশ্মশান আছে। তাই 'মা তারা লেক' গালি ব্যবহারের মধ্যে প্রতিপক্ষের মৃত্যু হোক অকালে, এই কামনা বিদ্যমান।

'বয়েস পেয়ে না', 'এই বয়সিই যাও', ইত্যাদি বাকবন্ধের মধ্যেও বিপরীতপক্ষের মৃত্যু কামনার ইচ্ছা বিদ্যমান। ভাইখাকি, মাখাকি, বুনখাকি শব্দগুলিও একই অর্থ বহন করে।

অসংস্কৃত, নিরক্ষর মহিলাদের মুখে 'বাপভাতারি', 'ভাইভাতারি', 'মামোগ[অ], বুনমুগ[অ], (বোনকে স্ত্রী বা মাগ করে যে) জাতীয় যেসব শব্দগুলি শোনা যায় সেগুলি স্পষ্টতই অজাচারের ইঙ্গিতবাহী।

আবার গালি হিসেবে পশু নামগুলির মধ্যেও এক ধরনের অবৈধ সংসর্গ বা পশ্বাচারের ইঙ্গিত থাকে। সেইজন্যই এতদঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষাতেও 'কুকুরের বাচ্চা', 'শুঅরের বাচ্চা' — ইত্যাদি শব্দ চরম অপমানকর ও অশ্লীল বলে গণ্য হয় কিন্তু অদ্ভুতভাবে 'বাঘের বাচ্চা', বা 'সিংহের বাচ্চা' বললে প্রতিপক্ষ তো অপমানিত হন না বরং গর্বে বুক ফুলে ওঠে।

১.৬ সমনাম (Homonyms) ঃ অভিন্ন ধ্বনি, ভিন্ন অর্থ

বিভিন্ন শব্দ যখন মান উচ্চারণে একইভাবে উচ্চারিত হয়, কিন্তু তার অর্থ হয় ভিন্ন তখন ওই শব্দগুলোকে বলে সমনাম বা সমধ্বন্যাত্মক শব্দ।[৩] সমনাম, দুটি অর্থ বা বহু অর্থবোধের সৃষ্টি করতে পারে। কোনো শব্দের বা বাক্যেরই এই অবস্থা ধরা হবে যদি তার একাধিক অর্থ করা যায়। নিচের বাক্যটির দুটি অর্থ হতে পারে।

'ভালোবাসা আমার কপালে নাই।'

— বাক্যটির প্রথম এবং স্বাভাবিক অর্থ ঃ বক্তার ভাগ্যে প্রেমভালোবাসা জোটেনি, সে হয়তো ব্যর্থ প্রেমিক, অথবা বিবাহিত জীবনেও অসুখী, স্ত্রীর ভালোবাসা সে কখনও পায়নি, অথবা তার কোনো আত্মীয় প্রিয়জন তাকে যথার্থই ভালোবাসে না বলে তার এই আক্ষেপোক্তি।

দ্বিতীয় অর্থ ঃ বক্তা ভালোবাসা অর্থাৎ বসবাসের জন্য উৎকৃষ্ট একটি বাড়ি খুঁজে খুঁজে মরছে কিন্তু

পেয়েও পাচ্ছে না, অথবা যেটা পাচ্ছে সেই বাসাটা তার মনোমত হচ্ছে না।
তবে 'ভালোবাসা' শব্দটি শুধু এই দুটি অর্থই বহন করছে না, অবস্থা, পরিবেশ তথা প্রসঙ্গের বিভিন্নতায় 'ভালোবাসা' শব্দটি কম করে দশ রকম অর্থ নির্দেশ করতে পারে —
ভালোবাসা = প্রেম, ভক্তি, স্নেহ, মমতা, অনুরাগ, আকর্ষণ, নেশা, দান, পছন্দ, আশীর্বাদ, বন্ধুত্ব, কোমল হৃদয়।
কয়েকটির বাক্যে ব্যবহার —
ক. অর পোতি ভালোবাসার লেগেই (আকর্ষণ) আমি এইঠিঞ আল্‌ছি।
খ. তার ভালোবাসাই (দান) আমাকে এদ্দূর ওঠার সুযোগ দিঙেছে।
গ. মৌয়ের সঙে রিমির ভালোবাসা (বন্ধুত্ব) অনেক আগে থেকিই।
ঘ. ছেল্যাদের পতি মাষ্টারের অসীম ভালোবাসা (স্নেহ) অর খুব মনে ধরিছিলো।
ঙ. ভগবানের পোতি ভক্তের ভালবাসা (ভক্তি) সবাই চায়।
চ. 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথার' প্রতি আমার ভালোবাসার (পছন্দ) কারণ অনেক।
ছ. মা'র ভালোবাসায় (আশীর্বাদ) উ অনেকদূর গেইচে।
জ. তাঁর ভালোবাসাই (কোমল হৃদয়) সবাইকে তাঁর প্রতি অনুরাগী করে তুলেছিল।

আমাদের আলোচ্য ক্ষেত্রের আঞ্চলিক ভাষায় যেসব সমনাম শব্দ রয়েছে সেগুলির কয়েকটি নিচে তুলে ধরা হল।

সমনাম শব্দ	**অর্থ**	**বাক্যে প্রয়োগ**
আ^{ই}ল্‌শ্যা	আখের শুকনো পাতা	আ^{ই}ল্‌শ্যা দিঙে আখা ধরাব।
আ^{ই}ল্‌শ্যা	অলস	অর মতোন আ^{ই}ল্‌শ্যা লোক আর দেখিনি।
আংঠি	অঙ্গুরী	সোনার আংঠি আবার ব্যাঁকা!
আংঠি	মাছ ধরার গর্ত বিশেষ	আংঠিতে জল ঢুকে সব মাছ দেলা বুঁ।
আলা	ক্লান্ত	আজ অ্যাক্‌বারে এলে গোবর আলা।
আলা	আলো	আলাটো একটু খাটিং দে।
আলান্‌	জোয়ালবাঁধা দড়ি	আলানটো কই?
আলান্‌	কেউটে	আলে একটো আলান দেখলম।
আড়ি	অসদ্‌ভাব	অর সঙে আমার আড়ি।
আড়ি	পাঁচ কেজি পরিমাণ	চিড়্যার লেগে একআড়ি ধান ভিজ্যালছি।
আড়ি	ছোট করাত	আড়ি দিঙে বাঁশ কাটবো।

সমনাম শব্দ	অর্থ	বাক্যে প্রয়োগ
কাটান্	গর্ত	কুলিটোতে খুব কাটান।
কাটান্	ধাঁধা	এই কাটানটোর জবাব দে দেখিনি।
কাঁ[ই]ড়	খড়ের গাদা	কাঁ[ই]ড়টো গোদে যেলছে।
কাঁ[ই]ড়	লোহার ফলা	পা[ই]ক্‌মারা কাঁ[ই]ড় দিঙে পা[ই]ক্‌টো মাল্লে।
কাঁড়ি	প্রচুর	কাঁড়িকাঁড়ি গিল্‌ছিল আর কাজের ব্যালায় অষ্টরম্ভা।
কাঁড়ি	তালগাছের গুঁড়ি	কাঁড়িটো পাকা লয়।
কাঁড়ি	স্ত্রী মহিষ	কাঁড়িটো পাঁচশ্যার দুদ্‌ দ্যায়।
ক্যার্‌	কার	পাঁঠিটো ক্যার?
ক্যার্‌	ইং. কেয়ার	উ কাওকিই ক্যার করে না।
কুঅ	কুয়া	কুঅটো সাঁফ কোত্তে হবে।
কুঅ	কুয়াশা	কুঅতে আলুর খুব ক্ষতি হয়।
কুঁড়ি	কুণ্ড	কালচোনাটো সারকুঁড়িতে দিস।
কুঁড়ি	কলি	কুঁড়িগুলা তুলছিস ক্যানি?
কুঁড়্যা	অলস	উ কুঁড়্যার হাড়্‌ডি।
কুঁড়্যা	গোরুর জাবনা খাবার পাত্র	কুঁড়্যাটো পুঁততে হবে।
কুট[অ]	খড়ের টুকরো	কুট[অ]গুল্যা গো[ই]লে দিতে হবে।
কুট[অ]	কাস্তে ইত্যাদিকে ধার করা	কেদ্যাটো কুট[অ]তে হবে।
কির‍্যা	কসম, প্রতিশ্রুতি, শপথ	উ কির‍্যা খেতে ওস্তাজ।
কির‍্যা	ক্রিয়াকর্ম	আজ কির‍্যা, কাল কামান।

সমনাম শব্দ	অর্থ	বাক্যে প্রয়োগ
কারা	বলা	অর সঙে আমার রা কারাকারি নাই।
কারা	প্রথম ব্যবহার করা	আজ হাঁড়িকারা সাঁকরাত্।
কারা	দেওয়া, টানা	আর সান্ কারতে হবে না, উ তুআর ভাশুর লয়।
খুঁসা	খোলস	সাঁপে খুঁসা ছেড়েছে।
খুঁসা	অল্প খনন করা	পিঁয়্যাজ খুঁসা হোলো?
খুঁসা	চিংড়ি	খুঁসা মাছের টক, খেতে খুব ভালো।
খ্যা	খেই	তোর কথার কোনো খ্যা প' যেছে না।
খ্যা	নিক্ষেপ, খেয়া	ক'খ্যা দিল্যাম, অ্যাকটুউ মাচ পেল্যাম না।
ঘাটি	বোতাম ভরার ঘর	জামার ঘাটিটো ঠিক কোত্তে হবে, বড় হোঙে গেল্ছে।
ঘাটি	আড্ডাস্থল	উ কুথা ঘাটি গেড়েছে কে জানে?
ঘাটি	গোরুর গাড়ি চলার মেঠো দাগ	উ মাঠে এখনো ঘাটি হয়নি।
ছিট্	ধানের আগাছা	ছিটগুলো ছাঁটতে হবে।
ছিট	কাটা কাপড়	পির‍্যানের ছিট কিনিছি।
ছুত[অ]	অচ্ছুৎ	ছুত[অ]কাপড়ে আমাকে লেড়িদিলি?
ছুত[অ]	অজুহাত	অর ছলছুতর অভাব নাই।
জাগা	জায়গা	ই জাগাটো ভালো লয়।
জাগা	জেগে থাকা	কাল গুটা রাত জাগা, আজ যেতে পারব না।
জাল্	চিংড়ি	ছোটজাল থাকলে জাল মাছ কটা ধোত্তে পাত্ত্যাম।
জাল্	মাছ ধরার ফাঁদ	মোটা লয়, সুরু জালটো দে।

জাল্	জ্বালানি	জালখ্যাড় কটা এনে দে, ভাত চাপাবো।
জাল	নকল	জিনিষটো জাল।
জালি	ছোট গোলাকার লাঠিতে বাঁধা জাল	জাল লয়, জালিটো দে।
জালি	কচি,ফুল	লাউয়ের লেহর জালি পড়েছে।
জুড়া	যুক্ত করা	নতুন বলদ জুড়া জুড়ে দ্যাখ আবোর কিনা।
জুরা	রাসায়নিক সার	বেচনটুই জুরা দিতে হবে।
ঝারা	চুরি করা	মালটো কোত্থেকে ঝাড়লি?
ঝারা	মুক্ত	অর কেউ কুথ্থাও নাই, উ সংসারে ঝারা হাত পা।
ঝারা	মন্ত্রসহ মালিশ করে দেওয়া	যা ঝারা ঝারলে, দরজ, একেবারে উধাও।
ঝারা	ঠায়	ঝারা একঘন্টা দাড়িং আছি।
ঠ্যাক্	বিপদ	ঠ্যাক না খেলে উ শুদ্‌রবে না।
ঠ্যাক্	অবশিষ্ট	আদা খেঙে আদার গুঁড়ায় ঠ্যাক্।
ডালি	ছোট ডাল	প' গাছটোতে অনেক ডালি বের‍্যাল্‌ছে।
ডালি	ধামা	নুটু একডালি মুড়ি খায়।
ডাঁড়া	ছিপ	ডাঁড়াটো দে, দুট[অ] মাছ দেখি।
ডাঁড়া	দাঁড়ানো	কখোন থেকে অর লেগে ডাঁড়িং আছি।
ডাঁড়ি	দাঁড়িপাল্লা	এই ডাঁড়িটোতে কচ্ নাই।
ডাঁড়ি	ডাঁটা	সাজন্যা গাছটুই অনেক ডাঁড়ি ধরেছে।
ডাঁট্	রোওয়াব, বে-পরোয়া	তোর এত ডাঁট্ ভালো লয়।
ডাঁট্	ছোট হাতল	ডাঁট্টুই ধর, গরুম কম লাগবে।

সমনাম শব্দ	অর্থ	বাক্যে প্রয়োগ
দর	গর্ত	এঁদুরে দর করে, সাপে ভোগ করে।
দর	দাম	ডালের দর জানো না, ভাতে গাড়া করেছো?
প'	চারা গাছ	পগারে পেকুরের প' লাগাল্‌ছি।
প'	পাওয়া	জিনিষটো কুড়িং প।
প'	সেচের কাজে ব্যবহৃত 'ওয়াই' আকৃতির কাষ্ঠদণ্ড	আমি দোন আর প'টো লিছি, তু যাঁত টো লে।
প'	পাদ	আজ এক প' চাল রেঁদিছি।
পাউঠি	সিঁড়ি	কুঠাঘরটোর মাটির পাউঠি।
পাউঠি	সেচের কাজে ব্যবহৃত বংশ দণ্ড	পাউঠিটো পৌওর[অ]গাড়ায় রেখে আয়।
পেল্যা	পোড়া মাটির হাঁড়ি	আজ পেল্যায় ভাত হবে।
পেল্যা	পেলে	বেল্যা, যা পেল্যা তাই পেল্যা।
পোঁর[অ]	মাছের পটকা	পোঁর[অ]টো অকে দে।
পোঁর[অ]	প্লাস্টিকের থলে	পোঁর[অ]তে করে মিষ্টি আনিস।
প্যাট	উদর	সকাল থেকে প্যাটে কিচ্ছু পরেনি।
প্যাট	অবৈধ গর্ভ	ছুঁড়ি প্যাট নামাল্‌ছে।
পাক	রান্না	আজ এক পাকের রাঁদা।
পাক	দিক	উ যি কুন পাকে য্যালো?
ফিট	ধবধবে	আমার পিয়্যানটো সাদা ফিট।
ফিট	অজ্ঞান	অর ফিটের ব্যারাম আছে।
বই	পুস্তক	ভূগোল বইটো আন।
বই	ব্যতীত	আমি বই অর কুনু গতি নাই।
বল	ইং. ফুটবল	আজ বল খেলার ম্যাচ্।
বল	ইং. বাল্ব	বলটো কেটে গেল্‌ছে।
বল	শক্তি	বেশি করে খা, তবিই বল হবে।

সমনাম শব্দ	অর্থ	বাক্যে প্রয়োগ
বিচ্যার	বিচার	ভগবান তুমি অর বিচ্যার কোরো।
বিচ্যার	বীজতলা	বিচ্যারে জুরা দোবো।
ব্যানা	হাতপাখা	ব্যানাটো দে।
ব্যানা	কঞ্চির তৈরি মাছ ধরার ফাঁদ	সুরু ব্যানা পাতব্যা, হামুনি পড়বে।
মাইগ্	স্ত্রী	উ যি অর মাইগ্।
মাইগ্	মাঘ মাস	ইবার মাইগে তেমন জাড় নাই, আরবার খুব জাড় ছিল।
সাঁই	দড়ির কাঠামো	গোদিটোকে সাঁই কোরে নিঙে যেতে হবে।
সাঁই	গে/গা	দোফোর বাউরিং য্যালো এবার ভাত খাওসাঁই।
হ্যালা	শালুকফুল	পুখুরখানটুই খুব লাল হ্যালা।
হ্যালা	অবহেলা	পড়াশুনা নিয়ে হ্যালাফ্যালা কোত্তে হয় না।

১.৭ সমার্থক শব্দ (Synonyms) ঃ ভিন্ন ধ্বনি অভিন্ন অর্থ

ভাষায় যে শুধুমাত্র অভিন্ন ধ্বনির ভিন্নার্থক শব্দই থাকে তা-ই নয়, এর উল্টোটি অর্থাৎ ভিন্ন ধ্বনির অভিন্ন শব্দ বা সমার্থক শব্দও প্রচুর থাকে। এখানকার আঞ্চলিক ভাষাতেও বহু সমার্থক শব্দ দেখা যায়। তারই কয়েকটি উদাহরণ নিচে দেওয়া হল।

ভিন্ন শব্দ	অভিন্ন অর্থ	বাক্যে প্রয়োগ
মুখে ভাত ভাতদ্যানি	অন্নপ্রাশন	আজ ছোটো ব্যাটার ভাতদ্যানি, তুমাদের ঘরগুষ্টি আপ্তনেমন্তান্ন।
নেমন্তান্ন দাওত	নিমন্ত্রণ	ব্যাটার শাদিতে দাওত দিঁই এল্যাম।

ভিন্ন শব্দ	অভিন্ন অর্থ	বাক্যে প্রয়োগ
লোকড়ি জালখ্যাড় খ্যাড়কাট্	জ্বালানি	খ্যাড়কাট কুড়িং আনল্যাম, এবার ভাত চাপাবো।
চুহ্যা এঁদুর	ইঁদুর	এঁদুরে গুঙলিং সব নামিং লিলে।
চ্যারাক্ ডিব্যা লম্ফু	লম্ফ/বাতি	চ্যারাক্টো বুতিং দে।
রম্ভা অম্ভা ক্যালা	কলা	এক হ্যালি ক্যালা দাও।
কাঁড়ি পাঁড়ি	স্ত্রী মহিষ	কাঁড়িটো গাঁইঠ্যায় দিঙিছি।
বাজি ডেলবাজি ভেলবাজি	প্রজাপতি	বাজিটো দ্যাক্ কি সোন্দর!
রুঙা রঁ পাতিলুম লুম	পাখির পালক	রুঙাগুলাকে সাহাড়গাড়িতে ফেলি আয়।
সোব্ট্যা চোড্ড[অ]	কলা গাছের শুকনো খোল	চোড্ড গুলা ছাড়া, জালখ্যাড় হবে।

ভিন্ন শব্দ	অভিন্ন অর্থ	বাক্যে প্রয়োগ
আল্‌শ্যা আউড় পুয়াল/প'ল	পোয়াল, নরম খড়	প'লের ছাতু খুব খেতে মিষ্টি।
আগরা পাথান	অপুষ্ট ধান	আগরাগুলা বল্‌লাবো।
বোল্‌টু ডোল/ডুল বোল্‌টিন্‌	বালতি	এক বোল্‌টু জল আন।
রা^{ই}খ্‌ কুসোর	আখ	রাখের গুড়টো ক্যামুন্‌ নুনছা।
লাহা ডুব দ্যা গা ধ'	স্নান	আজ একটু সকালো সকালো লাহাবো, মুরহ্যাডোই যাবো।
খই ডুম্‌ক[অ] ট্যাঙা ঢেকুর খোয়্যা	চোঁয়া ঢেকুর	কাল গরুমে খুব খই ডুম্‌ক[অ] উঠছিলো।
ছিচক্যা খুন্তি	খোন্তা	ছিচক্যাতে হবে না, ঝান্নাটো দে।
ভোত্যা কুমড়্যা পচা কুমড়[অ]	চাল কুমড়ো	আজ ভোত্যাকুমড়্যার চচ্চড়ি হবে।
ডিংল্যা/ডিংলি কোদিম্যা/কোদম্যা সুয্‌যি কুমড়্যা	মিষ্টিকুমড়ো	ডিংল্যার তরকারি ভোজে-কাজে ভালো।

ভিন্ন শব্দ	অভিন্ন অর্থ	বাক্যে প্রয়োগ
চাঁছি ম্যাওয়া ক্ষীরস্যা	ক্ষীর	খাঁটি ম্যাওয়া যা সদ!
ভিট্যা গোদি	কাণ্ড	গোদিটো ফুঁপ্‌র[অ]।
মরিচ সাম্‌র‍্যা	লঙ্কা	উরিব্বাস! সাম্‌র‍্যাটো যা ঝাল!
ডাঁড়ি ছুটি ডাঁটি	সজনে ডাঁটা	ডাঁড়ির চচ্চড়ি খুব ভালো।
আলপুন এল্যানো	আলপনা	আতব ভিজ্যালছি, এল্যানো দোবো।
খেঁচ্যা পেছ্যা	ঝুড়ি	এক পেছ্যামাটি নিঙায়, গো'লে দোবো।
কানকুটারি কেঁওর‍্যালি	কেন্নো	বানতানাস! কত বড় কানকুটারি দ্যাক্!
বুরা কোচ[অ]	বস্তা	কোচ[অ]র আলুকুটা ঘর নিং চো।

১.৮ বিশিষ্টার্থক শব্দ ঃ অর্থ পার্থক্য

শিষ্ট চলিত বাংলার মতোই বিশিষ্টার্থক কোনো শব্দ অন্য কোনো শব্দের সঙ্গে মিলে বিশেষ প্রসঙ্গে অর্থ প্রকাশ করে। যেমন — 'মুখ' শব্দটি। এর সাধারণ অর্থ মানুষের একটি প্রত্যঙ্গ, মুখবিবর। কিন্তু বিশিষ্টার্থক শব্দের অন্তর্গত হলে এর হরেক রকম অর্থ দাঁড়ায়। নিচে সেগুলি তুলে ধরা হল —

ক. মুক্ / মুখ

১. মুক্ করা (বকা) — ছুঁড়াকে অর বাবা যা মুক করা কোল্লে কী বলবো
(ছেলেটিকে তার বাবা যা বকল কী বলবো)।

২. মুক্ চুরা (লাজুক) — আমাদের আদু খুব মুখ চুরা, কুথাও যেঙে দুদিন থাকতে পারেনা
(আমাদের আদর খুব লাজুক, কোথাও গিয়ে দুদিন থাকতে পারে না)।

৩. মুক্ (ঝগড়ুটে) — আমাদের ছুটকির খুব মুক্, ঝগড়ায় বগড়া তুলে দেবে
(আমাদের ছোট বৌ খুব ঝগড়ুটে, ঝগড়ায় কেউ তাকে পারে না)।

৪. মুখ্ (দিক) — ই এই মুখে আর উ ওই মুখে গ্যালো
(এ এই মুখে আর ও ওই মুখে গেল)।

৫. মুখ (ভাষা) — মো'ধর কথায় কেউ ভুলিস্‌ন্যা, অর মুখে মোদু, ভেতরে বিশ্
(মধুর কথায় কেউ ভুলিস না, তার মুখে মধু, মনে বিষ)।

৬. মুক্ রাখা (সম্মান রক্ষা করা) — আমার একলোত্তি লাতিই আমার বংশের মুক্ রাখবে
(আমার একমাত্র নাতিই আমার বংশের সম্মান রক্ষা করবে)।

৭. মুক্ সামলিং (সংযত হয়ে) — মুক্ সামলিং কথা বল, আমি তোর খাই, না পরি
(সংযত হয়ে কথা বল, আমি তোর উপর নির্ভরশীল নই)।

৮. মুখে রস (শুষ্কতা, শালীনতা) — জন্মের সুময় কেউ অর মুখে মধু দ্যায়নি তো, তাই মুখে রস কষ নাই।

৯. মুক্ মরা (বিস্বাদ) — লাড়ুটো খেঙে একেবারে মুক মরে গেল
(নাড়ুটা খেয়ে একবারে মুখটা বিস্বাদ হয়ে গেল)।

১০. মুক্ মারা (বন্ধ করা) — অর কি কোরে মুক মাত্তে হয় আমি ভালুই জানি।
(তার কিভাবে মুক্ বন্ধ করতে হয় আমি ভালোই জানি।)

১১. মুক্ তুলা (নজর দেওয়া) — গরীবের দিকে মুক্ তুলে দ্যাখার কেউ নাই
(গরীবদের দিকে নজর দেওয়ার কেউ নেই)।

১২. মুক্ চলা (অনববরত বকবক করা, খেতে থাকা) — তোত্‌তো দেখছি সারাদিনই মুখ চলছে
(তুই তো দেখছি সারাদিন খেয়ে যাচ্ছিস)।

১৩. মুখের সামনে (সামনা সামনি) — মুখের সামনে অকে দুকথা শুনিং দিল্যাম
(সামনা সামনি তাকে দুকথা শুনিয়ে দিলাম)।

১৪. মুখের ভাত (অনায়াস) — এ কাজটো করা মুখের ভাত লয়, যাত্‌তার দ্বারা হবে না
(একাজটা যথেষ্ট কঠিন, সবার দ্বারা সম্ভব নয়)।

১৫. মুখ খারাপ (অকথ্য গালাগালি) — বীরবলা মুখ খারাপ কোত্তে ওস্তাজ
(বীরবল অকথ্য গালাগালি দিতে ওস্তাদ)।

১৬. মুখিং থাকা (তক্কে তক্কে, মারামারি) — সবসময় মুখিং থাকছিস ক্যানে, বিরাট বীর য্যানো
(সবসময় মারামারির জন্য প্রস্তুত হয়ে আছিস কেন, বিরাট বীর নাকি)!

খ. বিশিষ্টার্থক শব্দের মতো ধাতুও অন্য শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করতে পারে। যেমন, 'উঠ্' ধাতুটির দ্বারা নিম্নরূপ উদাহরণ সৃষ্টি হতে পারে ঃ

মাথায় ওঠা (আশকারা পাওয়া), ঘাটে ওঠা (শ্রাদ্ধকর্ম), চুল ওঠা (চুলের হ্রাস), চোখ ওঠা (চোখের রোগ), জ্বর ওঠা (জ্বর বৃদ্ধি),কথা ওঠা (জনরব), শিক্যায় ওঠা (কাজকর্ম না হওয়া), হাটে ওঠা (হাটে বাজারে পণ্য হওয়া), হুচুক ওঠা (হুজুগের সৃষ্টি), পাট ওঠা (বসতি স্থানান্তরিতকরা), লাটে ওঠা (ব্যবসা বন্ধ), ফুলে ফেঁপে ওঠা (ধনশালী হওয়া), মন ওঠা (মনোমত হওয়া), জাতে ওঠা (উন্নয়ন হওয়া), ওপরে ওঠা (পদোন্নতি) ইত্যাদি।

২. শব্দার্থ পরিবর্তন ঃ

শব্দের অর্থ মনস্তত্ত্ব নির্ভর। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির মানসিক গঠন ভিন্ন ভিন্ন। এই ভিন্নতার কারণে শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে অর্থবৈচিত্র্য ঘটে থাকে। কোনো কোনো ভাষাবিজ্ঞানীর মতে মানব মনের রহস্যকে বিজ্ঞানের নির্দিষ্ট সূত্রে সঠিক ও সম্পূর্ণভাবে বাঁধা সম্ভব নয়, সেজন্য শব্দার্থ তত্ত্বকে ঠিক বিজ্ঞানের পর্যায়ে ফেলা ঠিক নয়। কিন্তু আব্রাহাম নোয়াম চমস্কি প্রবর্তিত রূপান্তরমূলক-সৃজনমূলক (Transformational Generative) ভাষাবিজ্ঞানে শব্দার্থের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই মতবাদী ভাষাবিজ্ঞানীরা ভাষার দুটি দিককে মেনে চলেন — বহিরঙ্গ গঠন (Surface Structure) যা ধ্বনিপ্রবাহ (Sound Structure) দিয়ে গঠিত এবং অন্তরঙ্গ গঠন (Deep Structure) যা ভাষার অর্থ (Semantic Structure) দিয়ে গঠিত। বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ গঠন এবং ধ্বনি ও অর্থের যোগে ভাষার ক্ষেত্রে শব্দার্থের গুরুত্ব বহুগুণ বেড়ে যায়। এই শ্রেণির ভাষাবিজ্ঞানীরা অর্থের সঙ্গে যোগ রেখেই ভাষার বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করেন। তাই বলা যায় শব্দার্থের সঙ্গে ভাষার যোগ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

শব্দার্থ পরিবর্তনের ধারাকে ভাষা শাস্ত্রীরা মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করেছেন। সেগুলি হল —

২.১ অর্থবিস্তার বা সম্প্রসারণ (Expansion or Broadening বা Generalization of meaning) ঃ

কোনো শব্দের উৎপত্তিকালে তার একটি নির্দিষ্ট বা স্বতন্ত্র অর্থ থাকে। শব্দটি তখন কোনো বিশেষ ব্যক্তি, কোনো সীমাবদ্ধ বস্তু বা কোনো সংকীর্ণ ভাবকে প্রকাশ করতে নিয়োজিত হয়। পরবর্তীকালে শব্দটি পুরানো অর্থের বন্ধন না মেনে আরো ব্যাপকভাব, অধিকতর বস্তু বা বিষয়কে কিংবা নির্বিশেষ ব্যক্তিকে প্রকাশ করতে থাকে, ভাষাবিজ্ঞানের পরিভাষায় এটাই অর্থবিস্তার বা সম্প্রসারণ।[৪] আমাদের সমীক্ষান্তর্গত ক্ষেত্রের আঞ্চলিক ভাষায় বহু শব্দের অর্থবিস্তার বা সম্প্রসারণ ঘটেছে। যেমন —

ক. সজ্ — শব্দটি সংস্কৃত 'সজ্জা' বা হিন্দি 'সজ' জাত। যার অর্থ সজ্জিত হওয়া বা ভূষিত হওয়া। কিন্তু এখানে বিবাহের প্রথম বৎসরে বর এবং কনের উভয়ের বাড়ি থেকে দুর্গা পুজোর সময় প্রেরিত সাজসজ্জার উপকরণ, মিষ্টান্নাদি, আনাজ এবং নববস্ত্র প্রেরণকে 'সজ' বলা হয়।

খ. লটকোন — একসময় মুদির দোকানে লটকন নামে একপ্রকার ফল পাওয়া যেতো বলে অনুমান করা হয়।[৫] ঐ কারণে লটকন বা লটকোনার দোকান বলা হত। কিন্তু বর্তমানে মুদিখানা বা মুদির দোকান অর্থে লটকোন বা লটকোনা বলা হয়।

গ. ধুঅ — শব্দটি সংস্কৃত 'ধ্রুব'জাত। যার অর্থ কীর্তনাদি বা গানের যে পদ দোহারগণ বারবার গায়। কিন্তু এখানে যে কোনো প্রসঙ্গে বারবার একই কথা পরিবেশন করা বা বলাকে 'ধুঅ' বলা হয়।

ঘ. মারহাট্টা — শব্দটি 'মারাঠা' শব্দের সাদৃশ্যজাত। মারাঠা বর্গিরা মারামারিতে পারদর্শী ছিল। তারই সাদৃশ্যে যে অন্যকে মারধোর করে বা মারামারি করতে উৎসুক তাকেই 'মারহাট্টা' হিসেবে এখানে চিহ্নিত করা হয়।

ঙ. পাত্‌কাঠি — শব্দটির মূল পাটকাঠি। কিন্তু বর্তমানে শণ, ধঞ্চে, নালতে ইত্যাদি যে কোনো গাছের কাঠিকেও পাত্‌কাঠি বলা হয়।

চ. সার্ফো — শব্দটির মূল ইংরেজি 'Surf' যা একটি বিশেষ কোম্পানির ডিটারজেন্ট। কিন্তু বর্তমানে যে কোনো কোম্পানির ডিটারজেন্টকেই 'সার্ফো' বলা হয়।

একইরকমভাবে ক্রেতা যে কোন কোম্পানির দাঁতের মাজন কিনতে চাইলে দোকানদারকে 'কলগেট' দেন বা যে কোন বনস্পপতিজাত দ্রব্যকে 'দালদা' (Dalda) দেন বলেন।

ছ. গাড়োল্‌ — শব্দটি সংস্কৃত 'গড্ডল' শব্দজাত, যার অর্থ মেষ বা ভেড়া। কিন্তু এখানকার আঞ্চলিক ভাষায় ভেড়ার সাদৃশ্যে মূর্খের মতো পরের বুদ্ধিতে পরিচালিত অকর্মণ্য ব্যক্তিকে 'গাড়োল' বলা হয়।

জ. দুঅর — শব্দটি সংস্কৃত 'দ্বার' শব্দজাত, কিন্তু এখানে 'দ্বার' ছাড়াও দ্বার সন্নিহিত বারান্দাকেও 'দুঅর' বলা হয়।

ঝ. চ্যুতিয়্যা — শব্দটি সংস্কৃত 'চ্যুত' [√চ্যু + ত (ম)] শব্দজাত যার অর্থ ভ্রষ্ট, পতিত। কিন্তু এখানে গালিগালাজে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারী বা ভীরু ব্যক্তিকে 'চ্যুতিয়া' শব্দ দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।

ঞ. কন্টোল — শব্দটি ইংরেজি 'কন্ট্রোল' থেকে আগত। ১৯৪৬ সালে গণবন্টন ব্যবস্থায় খাদ্য সামগ্রীতে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। বর্তমানে এখানকার আঞ্চলিক ভাষায় রেশন দোকান এবং রেশন সামগ্রীকে 'কন্টোল' নামে চিহ্নিত করা হয়।

ট. গুঙাল্ — চাষ-বাসের ক্ষেত্রে জমির ছোট ছিদ্রকে গুঙাল বলা হয়। এর মধ্যে দিয়ে জল, উঁচু জমি থেকে নিচু জমিতে চলে যায়। গঙ্গা + ল প্রত্যয় যোগে শব্দটি সৃষ্টি হয়েছে বলে অনুমিত হয়। গঙ্গায় যেমন প্রচণ্ড গতিতে জল বয়ে যায় তেমনি তারই সাদৃশ্যে এই ছিদ্রে প্রচণ্ড গতিতে জল বয়ে যাওয়ার জন্য এটিও 'গুঙাল'।

ঠ. চোত্ পাগলা — চৈত্র মাসের অধিক গরমে পাগল হওয়া বা মাথা গরম হওয়া থেকে শব্দটির সৃষ্টি বলে অনুমান করা যায়। কিন্তু বর্তমানে যে কোনো সময়েই মাথা গরম হওয়া ব্যক্তিকেই চোত্ পাগলা বলা হয়।

ড. পির‍্যান — শব্দটি ফারসি 'পয়রাহান' শব্দ থেকে জাত, যার অর্থ ঢিলে জামা বিশেষ। কিন্তু এখানে যে কোনো জামাকেই পির‍্যান বলে।

ঢ. থম্ — শব্দটি 'স্তম্ভ' থেকে জাত যার অর্থ থামের মতো নিশ্চল। কিন্তু এখানকার ভাষায় কোনো ব্যক্তির, মেঘের, বাতাসের, নিশ্চল বা গুম মেরে থাকা অর্থে 'থম' শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

ণ. জন্ডিস — এটি একটি ইংরেজি শব্দ। শব্দটির অর্থ এক বিশেষ ধরনের রোগ। যাতে শরীর হলুদবর্ণ হয়ে যায় এবং সঠিক সময়ে চিকিৎসা শুরু না হলে রোগীর মৃত্যুও হতে পারে। কোনো ঘটনা জটিল আকার ধারণ করলে শব্দটির প্রয়োগ করা হয়। যেমন, 'ব্যাপারটো খুব জন্ডিস', বা 'কেস জন্ডিস' ইত্যাদি।

২.২ অর্থ-সংকোচন (Contraction of Meaning) ঃ

শব্দ বিশেষের মূল অর্থের ব্যাপকতা কমে গিয়ে সাধারণ বা নির্বিশেষ থেকে বিশেষের অভিমুখে গমন করলে অর্থসংকোচ হয়। শব্দের অনেকগুলি অর্থের মধ্যে একটিকে বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠা করাকেই অর্থসংকোচ বলা হয়। এই প্রসঙ্গে ড. সুবোধ কুমার যশ তাঁর 'সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে বাংলা ও নেপালি শব্দার্থ সমীক্ষা' গ্রন্থের ৮০ পৃষ্ঠায় বলেছেন, "আমাদের মনে কোনো বস্তু বা পদার্থ যে সমস্ত ভাবনা বা অনুভূতির জাগরণ ঘটায় সেই সমস্ত ভাবনাকে আত্মস্থ ক'রে কোনো ট.

শব্দ তাকে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করতে পারে না। স্বাভাবিকভাবেই এসব শব্দ বস্তুর অনেক রূপ বা উপাদানের কোনো একটি দিকের প্রকাশ ঘটিয়ে থাকে। অর্থাৎ এসব ক্ষেত্রে সমগ্রের আংশিক প্রকাশ ঘটে মাত্র। বিশেষ পরিস্থিতিতে উদ্ভূত অর্থের পরিবর্তনই অর্থসংকোচের অন্যতম কারণ।" এরকম কয়েকটি অর্থ সংকোচের উদাহরণ নিম্নে তুলে ধরা হল।

ক. পালা — অর্থ পাতা। যেমন, ডাল-পালা অর্থাৎ ডাল-পাতা। কিন্তু এখানে ছাগল ভেড়াকে খাওয়ানোর জন্য কাটা ছোট ছোট ডালপালাকে শুধুমাত্র 'পালা' বলা হয়।

খ. মুরগি — আবেস্তা মরেঘ + ই শব্দ থেকে হয়েছে মুরগি। আবেস্তা ভাষায় মরেঘ শব্দের অর্থ 'পক্ষী জাতীয় যে কোনো প্রাণী'। ফারসি ভাষায় এটি হল 'মুর্ঘ'। কিন্তু এখানে এবং শিষ্ট চলিত ভাষায় 'মোরগ' হল একপ্রকার গৃহপালিত পক্ষী বিশেষ এবং এ থেকে সাদৃশ্যে সৃষ্টি হল স্ত্রী লিঙ্গবাচক শব্দ 'মুরগি'।

গ. আহার — শব্দটি ব্যাপক অর্থে খাওয়াকে বোঝায়। কিন্তু এখানে 'আহার' অর্থে কেবলমাত্র সাপের ব্যাঙ ধরে খাওয়াকেই বোঝায়।

ঘ. ভুঁঙ — শব্দটি সংস্কৃতি 'ভূমি' থেকে জাত যার অর্থ মাটি। কিন্তু এখানে চাষের জমিকেই শুধুমাত্র ভুঁঙ্ বলা হয়।

ঙ. কামান — শব্দটির ব্যাপক অর্থ যে কোন সময় গোঁফ-দাড়ি কাটা বা মস্তক মুণ্ডন। কিন্তু এখানে অশৌচান্ত ক্ষৌরকর্ম হিসেবে 'কামান' শব্দটি প্রচলিত।

চ. খাদান — শব্দটি সংস্কৃত 'খাত' + আন (প্রত্যয়) থেকে জাত যার অর্থ গর্ত বা গভীর গর্ত। কিন্তু এখানে লাল মাটি বা কালো পাথর উত্তোলনের খনিকে বা খাতকে 'খাদান' বলা হয়।

ছ. মিত্যা — শব্দটি সংস্কৃত 'মিত্র' থেকে জাত, যার অর্থ বন্ধু। কিন্তু এখানে একই গ্রামে বসবাসকারী একই নাম ধারী প্রায় সমবয়স্ক দুই ব্যক্তি পরস্পরকে 'মিত্যা' বলে সম্বোধন করে।

জ. আঁকুর্ — শব্দটি সংস্কৃত 'অঙ্কুর' থেকে জাত। কিন্তু এখানে তাল আঁঠির মধ্যেকার অঙ্কুরিত সাদা অংশকে 'আঁকুর' বলা হয়।

ঝ. নাছ্ — শব্দটি সংস্কৃত 'রথ্যা'[১৮] থেকে এসেছে, যার অর্থ রথ চলার উপযুক্ত রাস্তা বা প্রশস্ত পথ। কিন্তু এখানে ঘরের মূল প্রবেশ দ্বারের সন্নিকটস্থ জায়গাকেই 'নাছ' বলা হয়, সেটি এমনকি গলিতেও অবস্থিত হতে পারে।

ঞ. খুঁপড়্যা — শব্দটিতে মৈথিলি 'খোপড়ী'র সঙ্গে মিল আছে, যার অর্থ কুটির বা ক্ষুদ্রগৃহ। এখানে শব্দটি খড়, বাঁশের তৈরি মাঠে নির্মিত পাহারার কাজে ব্যবহৃত আচ্ছাদনকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

ট. টহল — শব্দটির সঙ্গে হিন্দি 'টহলনা'র মিল আছে যার অর্থ পায়চারি বা চলাফেরা। কিন্তু এখানকার আঞ্চলিক ভাষায় 'টহল' শব্দটি বছরের একটি নির্দিষ্ট মাসে ভোর বেলায় ভগবানের নামগান করে গৃহস্থদের জাগানো বা ধর্মীয় প্রভাতফেরি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

ঠ. পেক্যার/পাইক্যার — শব্দটি ফারসি 'পাইকার' থেকে আগত যার অর্থ, যে মহাজনের কাছ থেকে কিনে অধিক দামে বিক্রি করে। কিন্তু এখানে পেক্যার বা পাইক্যার শব্দটির অর্থ কেবলমাত্র গবাদি পশুর ব্যবসায়ী।

ড. লাহারি — শব্দটি সংস্কৃত 'স্নান + আহার + ঈ' (প্রত্যয়) থেকে এসেছে। স্নানের পরে যে কোনো কিছু আহার করা যেতে পারে। কিন্তু আমাদের আলোচ্য ক্ষেত্রের উত্তর অংশে 'ভাত খাওয়া' অর্থে লাহারি শব্দটি প্রযোজ্য।

ঢ. মচ্ছব — শব্দটি সংস্কৃত 'মহোৎসব' থেকে জাত। পূজানুষ্ঠান থেকে প্রসাদ গ্রহণ সবই ছিল মহোৎসবের অঙ্গ। কিন্তু বর্তমানে কেবল খিচুড়ির প্রসাদ বন্টন এবং ভোজনই হল মচ্ছব।

ণ. চটুই/চঠহোই — সাঁও. 'চ্যাড়্যা' থেকে শব্দটি এসেছে বলে মনে করেছেন ড. সুবোধকুমার যশ তাঁর 'সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে বাংলা ও নেপালি শব্দার্থ সমীক্ষা' (পৃ. ১৭৯) গ্রন্থে, যার অর্থ সাধারণ পাখি। কিন্তু বর্তমানে শব্দটি তার পূর্ব অর্থের কৌলীন্য হারিয়ে একটি বিশেষ পক্ষীরূপে পরিচিত যা অর্থ সংকোচের নামান্তর।

ত. খাজা — শব্দটি সংস্কৃত 'খাদ্য'[৯] থেকে আগত, যার মূল অর্থ খাদ্য বা খাবার। বর্তমানে এর অর্থ ময়দাকে ঘিয়ে ভেজে তুলে রেখে চিনির রসে ডোবানো মিষ্টান্ন বিশেষ। এই মিষ্টির রস পরে শুকিয়ে যায়। ফলে এই মিষ্টি হয় হালকা, শুকনো, ফাঁপা, মুড়মুড়ে। বাঙালি সমাজে এই মিষ্টির অনভিজাত্যের ভাব থেকে শব্দটির অর্থাপকর্ষ ঘটেছে।

থ. পিঠ্যা — শব্দটি সংস্কৃত 'পিষ্টক' থেকে জাত। M.M.Williams পিষ্টক শব্দটির অর্থ করেছেন —Crushed, ground elasped, squeezed ইত্যাদি (A Sanksrit English Dictionary, page - 628)। বর্তমানে 'পিঠ্যা' শব্দের অর্থ পিষ্টক, বিশেষ মিষ্টান্ন। অর্থাৎ মূলের চূর্ণ বা গুঁড়া বাংলায় কার্যকারী হয়নি। পরিবর্তে ঐ চূর্ণ থেকে প্রস্তুত খাবার অর্থে বাংলায় প্রচলিত হয়েছে। ফলে এখানে শব্দটির অর্থসংকোচ হয়েছে।

দ. পোঁওর[অ][১০] — শব্দটি 'পুষ্করিণী' থেকে জাত যার অর্থ পুকুর। আমাদের আঞ্চলিক ক্ষেত্রে শব্দটির অর্থ জলসেচের কাজে ব্যবহৃত পুকুরের কিনারার নিকট জল সঞ্চিত হওয়ার গর্ত। শব্দটি পূর্বের বৃহত্তর অর্থ হারিয়ে সংকীর্ণ অর্থে প্রযুক্ত হচ্ছে বলে এটি অর্থসংকোচের উদাহরণ।

ধ. চোওকট — শব্দটি সং. চতুঃ + সং. কাষ্ঠ থেকে এসেছে। দরজা বা জানালার উপরের, নিচেরও দুপাশের কাঠ মিলিয়ে মোট চারটি কাঠ থাকে বলে বলা হয় চৌকাঠ। আমাদের আঞ্চলিক ভাষায় কেবলমাত্র নিচের কাঠটিকেই চোওকট বলা হয়।

২.৩ অর্থ-সংশ্লেষ বা অর্থ পরিবৃত্তি (Transfer of meaning) ঃ

ভাবের অনুষঙ্গের কারণে কখনও এক একটি শব্দের সঙ্গে মুখ্য অর্থ ছাড়াও এক বা একাধিক গৌণ অর্থ সংযোজিত হয়। তার পর কালক্রমে সেই গৌণ অর্থই মুখ্য অর্থকে স্থানচ্যুত করে। তখন মনে হয় শব্দটির অর্থ এক বস্তু থেকে একেবারে ভিন্ন বস্তুতে রূপান্তর হয়েছে। শব্দের এই ধরনের অর্থ পরিবর্তনই হল অর্থ সংশ্লেষ। অনেক সময় ক্রমাগত অর্থের বিস্তার ও সংকোচের ফলে পরিবর্তিত অর্থের সঙ্গে মূল অর্থের যোগ দুর্লক্ষ হয়ে পড়ে। তখন শব্দটির অর্থ এক বস্তু থেকে একেবারে ভিন্ন বস্তুতে রূপান্তরিত হয়। শব্দের এই ধরনের অর্থ পরিবর্তনকে অর্থসংশ্লেষ বলে। এখানকার ভাষার শব্দভাণ্ডারে এমন অজস্র শব্দাবলী পাওয়া যায় যার অর্থ পরিবৃত্তি ঘটেছে। যেমন —

ক. বে — ফারসি উৎসজাত এই শব্দটির আদি অর্থ ছিল 'মহাশয়'। বর্তমানে এখানকার আঞ্চলিক ভাষায় ব্যবহৃত মুসলমান সম্প্রদায়ের পুরুষদের মধ্যে বহুল প্রচলিত এই শব্দটি তার সেই পূর্বের সম্ভ্রমাত্মক অর্থ হারিয়ে তুচ্ছার্থে 'রে' অর্থে ব্যবহৃত হয়।

খ. ইস্টিল্ — শব্দটি ইংরেজি 'Steel' থেকে আগত। এখানে শব্দটি অ্যালুমিনিয়মের বাসন অর্থে ব্যবহৃত হয়।

গ. খোলপ্যা — শব্দটির মূল উৎস ফারসি 'খলিফহ', যার অর্থ সম্রাটের তথা মহম্মদের উত্তরাধিকারী অধিপতি (Caliph)। এখানকার কথ্যভাষায় শব্দটির অর্থ 'দরজি'। কর্মপটু, বা ওস্তাদ — শিষ্ট চলিত বাংলায় অর্থ বহন করে।

ঘ. পাইফেট — শব্দটি ইংরেজি 'Private' শব্দ থেকে আগত যার অর্থ ব্যক্তিগত। বর্তমানে বিদ্যালয়ের বাইরে বিশেষভাবে পড়াশোনাকে পাইফেট বলা হয়।

ঙ. লাইন — শব্দটি ইংরেজি 'Line' থেকে আগত যার অর্থ 'সারি'। বর্তমানে এখানে 'বিদ্যুৎ' অর্থে ও শব্দটি প্রচলিত।

চ. বোছুরকি — শব্দটি সংস্কৃত বাৎসরিকী থেকে এসেছে। যার অর্থ 'বর্ষভর'। এখানকার আঞ্চলিক ভাষায় ' বোছুরকি' শব্দটির অর্থ মৃতব্যক্তির মৃত্যুর একবৎসর পূর্ণ হলে সেই সম্পর্কিত শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ানুষ্ঠান।

ছ. সুনসান্ — শব্দটি 'শ্মশান' থেকে জাত, যার অর্থ মড়া বা শব দাহের স্থান। এখানকার ভাষায় শব্দটির বর্তমান অর্থ নিঃস্তব্ধ, শব্দহীন, নির্জন।

জ. সিন্দুক (লবণ) — শব্দটি 'সৈন্ধব' থেকে এসেছে যার অর্থ সিন্ধু দেশজাত বস্তু। কিন্তু বর্তমানে বিশেষ একশ্রেণির লবণকে 'সিন্দুক' লবণ বলা হয়।

ঝ. আগোর — শব্দটি সংস্কৃত 'অর্গল' থেকে এসেছে যার অর্থ 'খিল'। কিন্তু শব্দটির বর্তমান অর্থ বাঁশ বা কঞ্চির তৈরি বেড়ার দরজা। এজাতীয় দরজায় খিল থাকে না।

ঞ. তিস্‌দিন — শব্দটি 'তিরিশদিন' থেকে এসেছে। মাসের মধ্যে তিরিশদিন, তাই তিসদিন মানে বর্তমানে 'প্রতিদিন'।

ট. গুমর — শব্দটি ফারসি 'গমান' শব্দজাত, যার অর্থ 'ধারণা'। নির্দিষ্ট বিষয়ে পরিপূর্ণ ধারণার জন্য গর্ব হতে পারে। এখানকার ভাষায় 'গর্ব' অর্থে 'গুমর' শব্দটির প্রচলন আছে।

ঠ. ফাজিল — শব্দটির পালিতে অর্থ 'পণ্ডিত'। আবার আরবিতে 'ফাজিল' শব্দটির অর্থ 'পারদর্শী'। কিন্তু বর্তমানে 'ফাজিল' শব্দটি 'ইতর' বা 'কথায় কথায় আদিরসের শব্দ ব্যবহারকারী ব্যক্তি' অর্থে ব্যবহৃত হয়।

ড. ঘুরমগুলী — শব্দটি ' গৌরমণ্ডলী' থেকে এসেছে, যার অর্থ কীর্তনাদি শ্রবণের জন্য জনসমাগম। গৌরমণ্ডলীতে জন সমাগম ও চিৎকার চেঁচামেচি হয়। তাই ঘুরমণ্ডলী শব্দের অর্থ দাঁড়িয়েছে হৈ-হট্টগোল।

ঢ. পাঁজা — শব্দটি সং. 'পুঞ্জ' থেকে জাত, যার অর্থ রাশি বা স্তুপ। কিন্তু এখানে মাঠ পাহারার জন্য পাহারাদাররা বিঘা প্রতি যে ধান সংগ্রহ করে তাকেই বলে পাঁজা।

ণ. খুন্তি — শব্দটি সং. 'খনিত্র' থেকে আগত। Sir M. Monier Williams তাঁর 'A Sanskrit English Dictionary' গ্রন্থের ৩৩৬ পৃষ্ঠায় এর প্রতিশব্দ হিসেবে লিখেছেন 'an instrument for digging spade, shovel'. দেখা যাচ্ছে যে শব্দটির পূর্বে অর্থ ছিল খনির কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রাদি বিশেষ। বর্তমানে আমাদের আলোচ্য ক্ষেত্রে এর অর্থ, রান্নার কাজে ব্যবহৃত উপকরণ বিশেষ। এখানে শব্দটির অর্থ-সংশ্লেষ হয়েছে।

ত. খোঁটা[১১] — শব্দটি সাঁ. 'খুন্টা' থেকে এসেছে যার অর্থ বড় খুঁটি বা গাছের বড় গুঁড়ি। বর্তমানে এর অর্থ গঞ্জনা (খোঁটা দেওয়া)। আসলে খুঁটির একদিক হয় সূচালো যা সহজেই মাটিতে বিদ্ধ হয়। এই বিদ্ধ করার ভাব থেকেই খোঁটার অর্থ নিন্দার্থক বাক্য বা শব্দ যা অপরকে খোঁচা বা কষ্ট দেয়। এটি একটি অর্থ-সংশ্লেষের উদাহরণ।

থ. ঝকমারি — শব্দটি অস্ট্রিক 'ঝঁক' থেকে এসেছে যার অর্থ অভিযোগ বা প্রতিবাদের যোগ্য। হেমচন্দ্রের ' দেশী-নামমালা' (৩.৫৫) তেও 'ঝক্কিঅং' শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। বর্তমানে এর অর্থ ঝুঁকি, দায়িত্ব, উপদ্রব প্রভৃতি। তাই এটির অর্থ-সংশ্লেষ হয়েছে।

দ. লোলা — শব্দটি সাঁ. 'লুলহা' শব্দজাত যার অর্থ আঙুল ছাড়া হাত। P.O. Bodding তাঁর 'A Santal Dictionary' গ্রন্থের ১৮৭ পৃষ্ঠায় এর অর্থ হিসেবে দিয়েছেন — from joint to fingures। আমাদের আঞ্চলিক ভাষায় শব্দটির অর্থ-সংশ্লিষ্ট হয়ে 'জিহ্বা' এবং 'লোভী' হয়েছে।

ধ. বোকা/বুকা — শব্দটি তে., ক. 'বুক্ক'[১২] শব্দজাত যার অর্থ ছাগল। 'দেশী-নামমালায়' হেমচন্দ্র বোকা শব্দের অর্থ ছাগল বলেছেন। বর্তমানে শব্দটি নিন্দার্থে বা গালি অর্থে কখনো বা নির্বোধ অর্থে ব্যবহৃত হয়। শব্দটিতে অর্থ-সংশ্লেষ হয়েছে।

ন. ম্যাওয়া — শব্দটিকে এফ. স্টেইনগাস ফা. 'মীৱআ' থেকে আগত বলেছেন। যার অর্থ ফল বিশেষ। যেমন — বাদাম, পেস্তা, আখরোট[১৩] ইত্যাদি। এখানকার ভাষায় এর অর্থ ক্ষীর।

প. হাউশ — ড. হরেন্দ্রচন্দ্র পালের মতে শব্দটি আ. 'হওআস' বা 'হবস'থেকে এসেছে যার অর্থ আকাঙক্ষা, উৎসাহ, ইচ্ছা। কিন্তু আমাদের সমীক্ষা ক্ষেত্রের আঞ্চলিক ভাষায় শব্দটির বর্তমানে অর্থ হল আমোদ প্রমোদ।

ফ. ওরান — শব্দটি ফা. ৱীরান থেকে জাত যার অর্থ জনহীন। আমাদের সমীক্ষা ক্ষেত্রে ওরান শব্দটির মধ্যে দিয়ে কোনো ফসল ভর্তি জমির একই ফসল পার্শ্ববর্তী জমিতে না থাকাকে বা ফসলশূন্য হওয়াকে বোঝায়।

ব. আগল — শব্দটি সং. 'অর্গল' জাত যার অর্থ দরজার খিল। কিন্তু এখানে জমি, পুকুর, গাছ প্রভৃতি পাহারা দেওয়াকে আগল বলে।

ভ. সংস্কার — শব্দটি সং. থেকে আগত যার পূর্বে অর্থ ছিল শোধন বা প্রসাধন। এখানে শব্দটি মেরামত অর্থে বহুল প্রচলিত।

ম. ফিকির — শব্দটি আ. 'ফিক্র' থেকে এসেছে যার অর্থ চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-জ্ঞান, খেয়াল, সম্মতি ইত্যাদি। বর্তমানে এটির অর্থ ফন্দি বা ধান্দাবাজি।

য. গাবা — শব্দটি সং. 'গর্ভ' থেকে জাত যার অর্থ উদর বা পেট। এখানকার আঞ্চলিক ভাষায় এই শব্দটির অর্থ জলাশয়, নদীর ঢালু শুষ্ক গর্ভদেশ। এছাড়া 'গাবা ভরা' অর্থ খাইয়ে পেট ভরানো কিংবা 'গাবায় পোঁতা'র অর্থ শিশুদের মৃত্যু কামনা বিষয়ক গালি, কিংবা 'গাঁ গাবা' অর্থে কোনো ঘটনাকে রাষ্ট্র বা প্রচার করা। তাই গাবা শব্দটি মূল অর্থকে হারিয়ে অন্য অর্থকে প্রকাশ করছে বলে এটি অর্থ-সংশ্লেষ হয়েছে।

র. ঢ্যামন/ঢেমনি — শব্দটি মু. 'ঢাম' থেকে এসেছে, যার অর্থ হাস্য-পরিহাসকারী বা মিথ্যা অহংকারী। কিন্তু এখানকার সমীক্ষান্তর্গত ক্ষেত্রে বর্তমানে অবৈধ নাগর, রক্ষিতা বা উপপত্নী অর্থে গালি বাচক শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

ল. কারান — সং. 'কর্ষণ' থেকে শব্দটি এসেছে। কর্ষণের সঙ্গে কৃষির অঙ্গাঙ্গী যোগ। কৃষির সঙ্গে বর্ষা ঋতুও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাই কর্ষণ থেকে অর্থ পরিবর্তিত হয়ে, 'কারান' অর্থে 'অতিবৃষ্টি' হয়েছে।

ব. ভাজানো/ভাজান— শব্দটির এখানকার আঞ্চলিক ভাষায় পূর্বে অর্থ ছিল মুড়ির চাল। মুড়ির জন্য চাল তৈরি করা অনেক ঝামেলার কাজ। তাই তারই সাদৃশ্যে বর্তমানে 'ঝামেলা' শব্দটির পরিবর্তে 'ভাজানো'/'ভাজান' শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

উল্লেখপঞ্জি

১. হক, মহম্মদ দানীউল — ভাষাবিজ্ঞানের কথা, পৃ. ১৮০।
২. চৌধুরী, ড. দুলাল (সম্পাদক) — বাংলার লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ, পৃ. ১৩০।
৩. হক, মহম্মদ দানীউল — ভাষাবিজ্ঞানের কথা, পৃ. ১৯১।
৪. যশ, সুবোধকুমার — সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে বাংলা ও নেপালি শব্দার্থ সমীক্ষা, পৃ. ৭২।
৫. করণ, সুধীরকুমার — সীমান্তরাটী ও ঝাড়খণ্ডী বাঙ্‌লার গ্রামীণ শব্দকোষ, পৃ. ৫৪৯।
৬. তদেব, পৃ. ৩৭৯ ও ৫৪৮।
৭. ভট্টাচার্য, পার্বতীচরণ — বাংলাভাষা, পৃ. ৩০৯।
৮. তদেব, পৃ. ২৯৭।
৯. যশ, সুবোধকুমার — সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে বাংলা ও নেপালি শব্দার্থ সমীক্ষা, পৃ. ১২১।
১০. শহীদুল্লাহ, ডক্টর মুহম্মদ — বাংলা একাডেমী বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান, পৃ. ৬৭৯।
১১. যশ, সুবোধকুমার — সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে বাংলা ও নেপালি শব্দার্থ সমীক্ষা, পৃ. ১২১।
১২. তদেব, পৃ. ২২৪।
১৩. Steingass, F. — Comprehensive Persian - English Dictionary, page - 1365.